Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 142 – 152
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

মানিকের ছোটগল্পে প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বরের উত্থান, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা : প্রসঙ্গ 'শিল্পী' ও 'দুঃশাসনীয়'

ঋষভ চক্রবর্তী
বাংলা সাম্মানিক (বি. এ.), বাংলা বিভাগ
আনন্দ চন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি
Email ID : rishovchakroborty.mng@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ধনতন্ত্র, বণিকতন্ত্র, চেতনা, প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর, শোষকশ্রেণি, শ্রেণিশক্তি, স্বার্থান্বেষী সমাজ, শ্রেণিজাগরণ, বস্ত্রসঙ্কট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

Abstract
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসংকট ও কালোবাজারীর মধ্যে দিয়ে ধনতন্ত্রের যেই নিকৃষ্ট দিকটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ধরা পড়েছিল, তা থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'শিল্পী' ও 'দুঃশাসনীয়'-র মতো প্রতিস্পর্ধী গল্পগুলো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু গল্পে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার আমরা একত্রিত হতে দেখেছি শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের। মূলত মার্কসবাদে দীক্ষিত কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের বাইরে গিয়েও লিখেছেন খেটে-খাওয়া শ্রেণি তথা শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন। আমরা একদিকে যেমন পাই 'শিল্পী' গল্পে মদন তাঁতির নিজের কাজের প্রতি অব্যক্ত নিষ্ঠার ছাপ এবং শত দরিদ্রতা সত্ত্বেও প্রদীপের শিখার মতো জ্বলন্ত তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তেমনি আবার আমরা পাই 'দুঃশাসনীয়' গল্পে অভিমানী রাবেয়ার নিজের আত্মসম্মান বাঁচানোর তাগিদে পুকুরে আত্মাহুতি। 'শিল্পী' গল্পে বারংবার ধ্বনিত হয় একজোট হয়ে তাঁতিপাড়ার সকলের শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে অসহায় নগ্নছায়ামুর্তিদের হাতিপুর গ্রামে নিজের আত্মসম্মান রক্ষার্থে দুঃসাহসী রাবেয়ায় শেষ পরিণতি হচ্ছে আত্মহত্যা। এখান থেকেই মুখোশধারী সমাজের ব্যর্থতাকেই খুঁজে পাই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পটির কথা যদি ভাবি, তবে সেখানেও বস্ত্র সংকটের কাহিনী রয়েছে, সেখানেও নগ্ন ছায়া মূর্তিদের কথা রয়েছে; কিন্তু যেই বিষয়টি নেই তা হল প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বরের উত্থান এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছোঁয়া; অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' -তে আমরা খুঁজে পাই স্পর্ধা, একত্র শ্রেণিজাগরণ ও চরম লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে রাবেয়ার শেষ প্রতিবাদ। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎক্ষেপণ ছাড়া

কোনও ভাবেই সমাজে সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং তার ফল স্বরূপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন। এমনকি তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এ যোগ দিয়েছিলেন আনুমানিক ১৯৪৭ সালের গোড়ায়। তাই তাঁর বহু ছোটগল্পে রাজনীতি-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নানান আঙ্গিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্ররা নিজেরাই লড়াই করেছে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে, কারণ তাদের চেতনায় মিশে আছে প্রতিবাদের ভাষা। এটা খুবই সুস্পষ্ট ছিল যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই ছিল ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'শিল্পী' এবং 'দুঃশাসনীয়'-তে একত্র শ্রেণিশক্তি জাগরণের মধ্যে দিয়েই প্রতিস্পর্ধী চরিত্রগুলোকে খুঁজে পাই; যেই চরিত্রগুলো কখনোই নিজের আত্মসম্মানকে বিক্রি করতে রাজি নয়, চরিত্রগুলো নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছে গুলোর জন্য লড়াই করতে জানে। ক্রমেই সেই প্রতিস্পর্ধী চরিত্রগুলোর মধ্যে অবলীলায় প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

Discussion

অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষেদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ, পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে প্রতিস্পর্ধী চেতনার উন্মেষ এবং ধনতন্ত্র, বণিকতন্ত্রের মতো সব স্বার্থান্বেষী তন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভাবে স্থান পেয়েছে মার্কসবাদে দীক্ষিত কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু ছোটগল্পে। একটি সুস্থ সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য প্রয়োজন শ্রেণিজগরণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গঠন করা। প্রসঙ্গত, ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বানুসারে মূলত লিবিডো বা কামের প্রতীক হচ্ছে সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণীরা এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু লেখায় এই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট ভাবে লক্ষণীয়; তাই তো তাঁর লেখা 'প্রাগৈতিহাসিক' বা 'সরীসৃপ'-এর মতো গল্পে এই ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও মানুষের অতৃপ্ত যৌন কামনার প্রকাশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে এর বাইরেও তাঁর লেখার পরিধি অনেকটা সু-বৃহৎ। সেটি আমরা তাঁর লেখা বহু ছোট গল্পের (আলোচ্য : 'দুঃশাসনীয়', 'শিল্পী') মাধ্যমে জানতে পারি। মূলত 'মানুষ'-ই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বলা চলে। মানুষের মনের ভেতরের নানান সুখ-দুঃখ, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, সরল-জটিল চিন্তাধারা, আবার শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠা করা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গড়ে তোলা - এই সমস্তই তাঁর লেখায় প্রতিবারই উচ্চস্বরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় কখনোই আমরা কোনও স্বপ্নালু-প্রেমালু প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করি না। তিনি নিজেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশ ছিলেন, তাই তাঁর লেখায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিকতা ফুটে ওঠেনি; বরং ফুটে উঠেছে জীবনের কঠিন বাস্তব, ভদ্র সমাজের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক কৃত্রিম বিকারগ্রস্ত স্বার্থান্বেষী সমাজব্যবস্থা। এগুলোই তাঁকে প্রতিবার মানসিক ভাবে বিচলিত ও তুমুল ভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল বলে অনুমান করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষ ও কালোবাজারীর মধ্যে দিয়ে ধনতন্ত্রের যেই নিকৃষ্ট চেহারাটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, তখন থেকেই তিনি হয়তো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎক্ষেপণ ছাড়া কোনও ভাবেই সমাজে সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং তার ফলস্বরূপ তিনি সেই সময় মার্কসবাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন। এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' - এ

যোগ দিয়েছিলেন আনুমানিক ১৯৪৭ সালের গোড়ায়। তাই তাঁর বহু ছোটগল্পে রাজনীতি-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নানান আঙ্গিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমাদের আলোচ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'শিল্পী' ও 'দুঃশাসনীয়' গল্পদুটোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় রচিত। মূলত এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে চোরাকারবারিদের উৎপাতে প্রবল বস্ত্রের সংকট এবং ফলশ্রুতি রূপে দরিদ্র গ্রাম বাংলার মানুষের যে শোচনীয় দুরবস্থার করুণ চিত্রটি মূলত আমরা গল্পদুটিতে লক্ষ্য করি। পরবর্তীতে মূলত শ্রমজীবী মানুষদের একত্র হওয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সুতো বয়কট আন্দোলন, একত্র হয়ে শ্রমিক ধর্মঘট, প্রতিরোধ গড়ে ওঠা প্রভৃতি 'শিল্পী' গল্পটিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 'শিল্পী' গল্পের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে মদনতাঁতি সকালে দাওয়ায় বসে শীতের রোদ পোহাচ্ছিল এবং সেই মুহূর্তেই তার পায়ে অসম্ভব খিঁচ ধরে। এই খিঁচ ধরার কারণ মূলত ছিল তার সাতদিন ধরে তাঁত না চালানো। তার হাতে-পায়ে, কোমরে-পিঠে আরষ্ট বেতো ব্যথা ধরেছিল এবং পাশাপাশি তার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি শুরু হয়েছিল। এই তাঁত না চালানোর মূল কারণ ছিল সুতোর অভাব। তাই আমরা গল্পে পাই –

> "ঘন্টার পর ঘন্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়নচড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দুদিনে, ঘুম আসে না, মনটা টনটন করে একধরনের উদাস-করা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে।"[১]

তো মূলত কেন এই সুতোর অভাব? এই সুতোর অভাবের পেছনে মূলত দায়ী তৎকালীন লোভী শোষক শ্রেণিভুক্ত কিছু মানুষ অর্থাৎ মিহিরবাবু এবং ভুবন ঘোষের মতো মানুষেরা। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় অন্যান্য জিনিসপত্রের মতোই কাপড়-বোনার যে সুতো, সেটাকে নিয়েও নানান কালোবাজারি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ গরীব তাঁতির পক্ষে বাজার থেকে অনৈতিক দামে সুতো কিনে কাপড় বোনা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। তাদের কাছে একটি মাত্রই রাস্তা খোলা থাকতো বাধ্য হয়ে দাদন (অগ্রিম বায়না) নিয়ে বেশি দামে সুতো কেনা। মিহিরবাবু এবং ভুবন ঘোষালের মত ধূর্ত সুতো - চোরাকারবারীরাই এই নিকৃষ্ট কাজটি করতো। আবার এই বেশি দামে সুতো বিক্রি করে ইচ্ছে করে প্রায় অর্ধেক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গামছা এবং কাপড় তারা বুনিয়ে নিতো। তো আমরা পরবর্তীতে গল্পে দেখি যে গোটা তাঁতিপাড়া মিহিরবাবুর কাছ থেকে অনেক বেশি দামে সুতো কিনবে না ঠিক করেছে। কারণ এই স্বার্থান্বেষী মিহির বাবু বেশি দামে সুতো দেবেন আর মজুরির বেলায় দেবেন তার একদমই অর্ধেক পারিশ্রমিক। অতএব তাঁতিরা শেষ পর্যন্ত তার কাছে দেনাদার হয়েই থাকবে এবং মিহির বাবু খুব সহজেই সেই তাঁতগুলোকে কিনে নেবেন। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধেই মূলত তাঁতিমহলের সঙ্গবদ্ধ প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল এবং তাদের প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল মদনতাঁতি। এই প্রতিবাদই ক্রমশ সুতো বয়কট আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। তাই গল্পে আমরা আরও পাই –

> "সুতোর অভাবে তাঁতিপাড়ার সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতিপাড়া থমথম করছে; শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।"[২]

মূলত তাঁতিপাড়ায় মদন তাঁতির নামটাই ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। মদনতাঁতি কোনদিনও সস্তায় কোনও কাপড় বোনেননি। এমনকি তার সাত পুরুষের তাঁতি বংশ দ্বারাও নাকি বেনারসী বোনা হতো। এখন বেশি দামের কোনও কাপড় মদন না বুনলে তার মন ভরে না। এই মদন কোনও ভাবেই ভুবন ঘোষাল ও মিহিরবাবুর কাছ থেকে বেশি দামে সস্তার সুতো কেনার পক্ষে নয়। আবার ভুবন ঘোষাল এবং মিহিরবাবু ভালোভাবেই জানেন যে মদনকে যদি কোন ভাবে হাত করা যায়, তাহলে গোটা তাঁতিপাড়াকেই তারা হাত করতে সক্ষম হবে। কারণ গোটা তাঁতিপাড়াই মদনতাঁতির ওপর বিশ্বাস করে। কারণটা আমরা গল্পেই পাই। যথা ---

> "রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি।"[৩]

এই মদন সহজে মাথা নত করে না, এখান থেকেই মদনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতোর অভাবে সাত দিন ধরে যে সে কিছুই বুনতে পারেনি, শুধু তাইই নয়, অর্থাভাবে তার নয় মাসের গর্ভবতী স্ত্রী একবেলা ভাত খেতে পাচ্ছে না; তার স্ত্রী রীতিমতো তিন বেলা উপবাস করে রয়েছে। কোনও বুদ্ধি না পেয়ে ধূর্ত ভুবন ঘোষাল এবারে এক কু-ফন্দি আটে। ভুবন ঘোষাল মদনতাঁতিকে লোভ দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়, সে লোক দিয়ে মদনের বাড়িতে সুতো পাঠিয়ে দেয়। এবার অর্থাভাবে জর্জরিত মদনও বেশ চাপের মুখে পড়ে যায়। মদন শেষ পর্যন্ত কী করবে, তা নিয়ে মদন নিজেই ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে মদনতাঁতি কখনোই গামছা বুনতে ইচ্ছুক নয়। সে তার সম্মানকে বেশি প্রাধান্য দেয়, সে তার পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যকে আজও সম্মান করে। মদনের কাছে হয়তো অর্থ না থাকতে পারে, কিন্তু মদনের কাছে রয়েছে স্পর্ধা, তার চেতনায় রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তাই তো আমরা গল্পে মদন প্রসঙ্গে জানতে পারি –

"মদন তাঁতি! মদন তাঁতির কাপড়! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি!"[৪]

অবশেষে মদন তাঁতি সেটাই করে যেটা তার কাছে সঠিক মনে হয় এবং তার এই সিদ্ধান্তই গোটা তাঁতিপাড়ার কাছে একত্রিত হয়ে লড়াই করার একটি প্রধান পন্থা হয়ে দাঁড়ায়। ভুবন ঘোষালের সেই সস্তার গামছা বুনে দিতে সে একদমই রাজি হয় না।

অন্যদিকে তাঁতিপাড়ায় সেই রাতেই মদনের ঘর থেকে তাঁত চালানর শব্দ শুনতে গোটা গ্রামবাসী –

> "সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে, মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুর শিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁতঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক।"[৫]

ফলে তাঁতিরা স্বাভাবিক ভাবেই ভাবতে শুরু করে যে মদন হয়তো নিজের স্পর্ধাকে বিক্রি করে ভুবন ঘোষালের সস্তার গামছা বুনে দিতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু না। যেমনটা ভাবা হচ্ছে তা নয়। মদন কোনও কাপড় বোনেনি। মদন শুধু হাতে পায়ে খিঁচ ধরে যাওয়ার জন্য সারারাত ধরে সুতো ছাড়াই তাঁত চালিয়েছে। মদন কখনোই নিজের চরম দারিদ্রতা সত্বেও নিজের সম্মানকে, সত্ত্বাকে বিক্রি করেনি। মদনের চেতনা কখনোই তাকে শেখায়নি মাথা নিচু করে চলতে। জীবনে যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন, তার মোকাবিলা করতে জানে মদন এবং মদন এও জানে আজ যদি সে সস্তার গামছা বোনে, তাহলে গোটা গ্রামও হয়তো তার মতোই সস্তার গামছা বুনতে শুরু করবে। ফলে নিমেষেই হেরে যাবে এই শ্রমজীবী মানুষদের বিদ্রোহ, লড়াই। তাই এই শ্রমজীবী মানুষদের লড়াইকে অখুন্ন রাখতে মদন সারারাত শুধু তাঁত চালিয়েছে কোনও সুতোর ব্যবহার ছাড়াই। এমনকি তাঁতিপাড়ার সকলকে আশ্বস্ত করতে মদন তার প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে–

> "চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে রাতে, তাই খালি তাঁত চালালাম এটা। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—"[৬]

আবার 'দুঃশাসনীয়' গল্পেও আমার লক্ষ্য করি বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য বস্ত্রের অভাব এবং সেটিকে কেন্দ্র করে দরিদ্র হাতিপুর গ্রামের মানুষদের অবর্ণনীয় কষ্টের ও দুর্দশার চিত্রটি আমরা গল্পে খুঁজে পাই। তবে এই গল্পের নামকরণে একটি বিশেষ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে এবং তা আলোচনার শুরুতেই জেনে নেওয়া ভীষণভাবে আবশ্যক। আমরা সকলেই মহাভারতের কাহিনি সম্পর্কে কমবেশি ধারনা রাখি। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে, পাণ্ডবেরা পাশা খেলায় হেরে যাওয়ায় কৌরবদের দুঃশাসন প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের জন্য উদ্দ্যত হয়েছিল এবং ঠিক সে সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বস্ত্রহরণ থেকে রক্ষা করেছিলেন তাঁর দৈব ক্ষমতার মাধ্যমে। কিন্তু তৎকালীন হাতিপুর গ্রামের অগণিত দ্রৌপদীর বস্ত্র যখন দুঃশাসনের মতো চোরাকারবারীরা ক্রমাগত অপহরণ করে যাচ্ছিল, তখন কিন্তু তাদের লজ্জা নিবারণ করার জন্য বা তাদের মর্যাদা রক্ষার্থে কোনরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেনি অর্থাৎ সেই সময় দুঃশাসনের মতো চোরাকারবারীরা সদর্পে তাদের স্বৈরাচারী ধণতন্ত্রের জোর খাটিয়ে এই অসম রাজত্ব চালিয়ে গেছিল। তাই আমরা গল্পটিতে পাই –

> "কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু-সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।"[৭]

গল্পের একদম শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল পূর্বের কথা বলছেন, তখন গভীর রাতেও যদি কেউ হাতিপুর গ্রামে এসে উপস্থিত হত, তাদেরও লোকবসতির বাস্তব অনুভূতিতে নাকি বেশ স্বস্তি মিলত। কিন্তু বর্তমানে হাতিপুর গ্রামে সন্ধ্যার পর যদি কোনও আগন্তুক গ্রামে চলে আসে তবে সে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, কারণ সন্ধ্যার পর এই গ্রাম আর তার পূর্বের মতো স্বাভাবিক পরিবেশে থাকে না। এই গ্রামের চারিদিকে আজকাল সন্ধ্যার পর অসংখ্য ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করা যায় এবং এই ছায়া মূর্তিগুলো একদমই কোন ভূত বা প্রেম কিন্তু নয়। এই ছায়ামূর্তি গুলো হচ্ছে বস্ত্রহীন স্ত্রীলোকের দল বিশেষ। বলতে গেলে যতক্ষণ দিনের আলো থাকে ততক্ষণ এই বস্ত্রহীন স্ত্রীলোক লজ্জায় ঘর থেকে বেরোতে পারে না। তাই একমাত্র রাত হলেই তারা তাদের দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত কাজকর্ম এবং সাংসারিক প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হন। আর এই নগ্নমূর্তি প্রসঙ্গে আমরা গল্পে পাই–

> "সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোনো কোনো ছায়া একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ-ভাই স্বামী-শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোকসুলভ লজ্জায়।"[৮]

আমরা আরও চরম দুর্দশার কথা জানতে পারি এই দরিদ্র নগ্ন নারীমূর্তি গুলোর বিবরণ পড়লেই। এই করুন ছায়ামূর্তিগুলোর রাতের অন্ধকারে করা কাজের বর্ণনাগুলো আমরা যদি দেখি, তা দেখলে চোখ আঁতকে ওঠে। এমনকি নিরীহ নগ্ন নারীমূর্তিগুলো যখন রাতের আড়ালে বাইরে বিবিধ প্রয়োজনীয় কাজ করতে থাকে, তখন হঠাৎ কোনও ঝোপের আড়াল থেকে শব্দ পেলে বিষন্ন মন নিয়ে বলে ওঠে, যে সেখানে কি কেউ রয়েছে? আসলে নিজের নগ্নতাকে ঢাকতে চায় তারা। আদৌ এই অবস্থায় তাদের কাছে স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে কিছু রইল কি? পর্যাপ্ত খাদ্যাভাবে তাদের দেহগুলো সম্পূর্ণ অপুষ্ট অথচ তাদের পরিপুষ্ট স্তন। এই প্রসঙ্গে আমরা গল্পে দেখি––

> "ধুলায় ধূসর হয়ে যায় তার অপুষ্ট দেহ ও পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা"[৯]

আমরা এটাও দেখতে পাই যে এই নগ্ন নারীমূর্তি গুলো শেষ পর্যন্ত তাদের লজ্জা নিবারণের স্বার্থে নিজেদের দেহ বিক্রি পর্যন্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই অবস্থাতেও আব্দুল আজিজ আর সুরেন ঘোষের মতো লোভী স্বার্থান্বেষী ধনতন্ত্রের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ব্যবসায়ীরা হাতিপুরের প্রায় একুশশো দরিদ্র চাষী ও কামার–কুমোর–জেলে–জোলা-তাঁতি আর আড়াইশো ভদ্র স্ত্রী-পুরুষের কাপড় যোগানোর দায়িত্ব কাধে কাঁধে নিয়েছে। কিন্তু সেই লোভী ব্যবসায়ীরা সরকারি পারমিটে কাপড় তুলেও সেগুলোকে হাতিপুরের মানুষের কাছে বিক্রি করে নি, তারা সেই কাপড় অর্থের লোভে চোরাকারবারীর কাছে চালান করে দিয়েছে। এটা করতে তাদের সাহায্য করেছেন দারোগা সুদেব। এই অনাচারই চলছে সমগ্র হাতিপুর গ্রাম জুড়ে। আবার বস্ত্রের অভাবে যখন হাতিপুর গ্রামের মেয়েদের দুরবস্থা চলছে, তখন গোকুলের বোন মালতীর কাছে বেনারসী শাড়ি রয়েছে। সেটা কীভাবে সম্ভব হচ্ছে? সম্ভব হচ্ছে দেহবিক্রির আশ্রয় নিয়ে। দাশু কামারের মেয়েটিও নগ্ন ছাড়ামূর্তি ছিল আগের রাত অবধি, কিন্তু আজকে সেও বাধ্য হয়ে মালতীর দলে যোগ দিয়েছে অর্থাৎ দেহবিক্রির পথ বেছে নিয়েছে। আসলে সামান্য বস্ত্রের জন্যই মালতী ও বিন্দুর মতো মেয়েদের দেহবিক্রির পথ বেছে নিতে হচ্ছে। এতটাই চরম দুর্দশা সমগ্র হাতিপুর গ্রাম জুড়ে। এই প্রসঙ্গে গল্পে পড়ি–

> "সতেরো মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশো তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেক শো গাঁট ধুতি শাড়ি জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়া মাস।"[১০]

এই অসহায় পরিস্থিতিতেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে আনোয়ারের স্ত্রী রাবেয়া কোনও ভাবেই নিজের আত্মমর্যাদা কে দ্বিখন্ডিত করতে রাজি হয়নি। এমনকি রাবেয়া তার প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বরে গর্জে ওঠে এবং আনোয়ারকে জানায়–

> "আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।"[১১]

রাবেয়া নিজের আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিয়ে কোনও প্রকার পদক্ষেপই গ্রহণ করবে না, কারণ রাবেয়ার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, রয়েছে মর্যাদাবোধ, তার প্রতিবাদী চেতনায় রয়েছে নির্ভীক প্রতিরোধের ভাষা। গল্পে আমরা আরও দেখতে পেয়েছি যে শহরের বাবুরা তাদের স্ত্রীর জন্য নানান সুন্দর সুন্দর শাড়ি এনে দিত অথচ রাবেয়ার জন্য একখানা কাপড় পর্যন্ত জোগাড় করতে অপারগ ছিল স্বামী আনোয়ার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পের মতোই 'দুঃশাসনীয়' গল্পেও ধনতন্ত্রের স্তম্ভ লোভী ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ চালিয়ে যায়। আমরা গল্পে পাই–

> "সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে, সাত ওয়াগন। আমি দেখেছি, পুলিশ দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুনে গুনে চালান দিল।" [১২]

অভিমানী রাবেয়া দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠনের আবছা অন্ধকারে নেমে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর সে তার স্বামী আনোয়ারকে অবাক করে দিয়ে তার গায়ে জড়ানো নোংড়া চটটিকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় উঠোনের একটি কোণে। সে তার স্বামীকে জানায় যে তার বড় ঘেন্না লাগছে, তার পা কুটকুট করছে এই চটের জন্য। ঠিক এখানেই আনোয়ারের মনে একটু করে ভয়েরও জন্ম হয়। ঠিক তারপরে সেই ঘটনাটি ঘটে, যেটি আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারি না। আনোয়ারকে রাতের খাবার খাইয়ে, রাবেয়া সানকি ও কলসি নিয়ে ঘাটে চলে যায় এবং তারপর আর কখনও সে ফিরে আসে নি। আমরা গল্পের শেষে পাই–

> "কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।"[১৩]

অর্থাৎ এখান থেকে আমরা দরিদ্র রাবেয়ার আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করি। রাবেয়ার স্বামী আনোয়ার যখন তাকে বস্ত্র এনে দিতে একদমই অপারগ, তখন রাবেয়া বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় এবং তার এই আত্মহত্যা বণিকতন্ত্রের, ধনতন্ত্রের দাস হৃদয়হীন পাষান সমাজের বুকে তার তীব্র ক্ষোভ, ঘৃণা ও অভিযোগগুলিকেই নির্দেশ করে। রাবেয়া মৃত্যু বরণ করেছে কিন্তু তবুও সে তার নগ্নরূপকে ঢাকতে বস্ত্রের জন্য দেহবিক্রির পথে নামেনি। বারংবার এই দরিদ্র হাতিপুরের গ্রামবাসীরা এই কলুষিত সমাজের বুকে শোষিত হয়ে এসেছে। আজ রাবেয়ার মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? রাবেয়ার মৃত্যুর জন্য কি শুধু তার স্বামী দায়ী, যে তার স্ত্রীকে বস্ত্র এনে দিতে পারেনি? নাকি এর জন্য তৎকালীন চোরাবাজারীরা দায়ী, সমাজ দায়ী, সমাজব্যবস্থা দায়ী? রাবেয়ার মৃত্যু শুধুমাত্র মৃত্যু নয়, রাবেয়ার মৃত্যু এই কলুষিত সমাজের কাছে একটি বার্তা যে, ধনতন্ত্রকে ভেঙে দিয়ে, বণিকতন্ত্রকে ভেঙে দিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করা ভীষণভাবে জরুরী। বাঁচার অধিকার কি নেই তাদের? কেন হাতিপুরের গ্রামবাসীদের দেহবিক্রি করতে হচ্ছে সামান্য বস্ত্রের জন্য অথবা রাবেয়াকে চরম লাঞ্ছিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হচ্ছে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আমরা বাস্তবেই প্রদীপের জ্বলন্ত শিখার নীচে জমে থাকা কালো অন্ধকারটিকেও স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই। লেখক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে–

> "এ গল্পের লড়াই শুধুমাত্র পুঁজিবাদ জার শাসন- শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, এ হলো মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের দাবী মেটানোর লড়াই। পরের শেষে রাবেয়ার আত্মহননজনিত নিরুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে একটি ঐতিহাসিক শক্তি চিত্রিত হয়। আর এই শক্তি অবশ্যই প্রগতিশীল। সমস্ত মহৎ শিল্প সামাজিকভাবে প্রগতিশীল, কেননা, সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশের অনতির্নিহিত ক্ষমতা জটিলতা সমেত সেখানে রূপায়িত হয়।"[১৪]

স্পর্ধার প্রসঙ্গ এলেই, মদনতাঁতি বাস্তবেই শোষকশ্রেণির ঘাড় ভেঙে দিতে সমর্থ হয়েছে বারংবার। মদনতাঁতি সদর্পে প্রমাণ করেছে যে তাকে প্রলোভন দিয়ে কিনে নেওয়া যায় না, কারণ তার চেতনায় মিশে রয়েছে তার নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। গল্পের মধ্যে এই বিষয়টি খুবই স্পষ্ট ছিল যে একটি সংগ্রামী শ্রেণির কাছে তাদের আত্মমর্যাদা, তাদের প্রতিরোধের ভাষাই প্রধান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পদুটিতেই সেই রাজনৈতিক মতাদর্শের স্পষ্ট উল্লেখ পাই। বাংলা কথাসাহিত্যে আমরা নানান গল্প পড়েছি, কিন্তু তার মধ্যে যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসঙ্গ আসে, সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলো একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। বিশেষ করে 'শিল্পী' গল্পের অন্তিমলগ্নে মদন তাঁতির শেষ কথাগুলো যেন বারবার তার প্রবল শক্ত মেরুদন্ডেরই পরিচয়বাহক। এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার সেই শোষক ধনতান্ত্রিক শ্রেণিয় বিরুদ্ধে লড়ার পদ্ধতি দেখিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন তাঁর প্রতিস্পর্ধী চেতনার মাধ্যমে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবলীলায় এই ধনতন্ত্রের ভঙ্গুর অচলায়তনকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে শিখিয়েছেন। তিনি কখনোই শুধুমাত্র বস্ত্রসংকটকে দেখাতে চাননি তার গল্পে অথবা শুধু সুতো নিয়ে যেই চোরাকারবারী হয়েছে তাতেই তিনি থেমে থাকতে চাননি; তিনি গল্পে দেখাতে চেয়েছেন এক সংগ্রামী শ্রেণির কথা, কর্মনিষ্ঠায় একাগ্র মদনতাঁতির কথা। এই মদনই সেই প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর যা গোটা তাঁতিপাড়ার মানুষদের মনে সাহস যুগিয়েছে, তাদের লড়াই করার মন্ত্র শিখিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র গরিবদের দুঃখ-কষ্টকে দেখাতে চাননি, সেই মানুষ গুলোর মধ্যে যে প্রতিবাদের স্পৃহা রয়েছে তাও তিনি তাঁর গল্পের মাধ্যমে আমাদের দেখিয়েছেন। বাস্তবেই এই মদনতাঁতির মতো প্রতিস্পর্ধী চরিত্র গল্পে আর নেই বলাই ভালো কারণ প্রায় সর্বক্ষণ তাকে তার বন্ধ তাঁত চালাতে উদ্বুদ্ধ করে যায় লোভী ভুবন, কিন্তু মদনতাঁতি তার কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও তার শিল্পসৌন্দর্যের বোধ ও নান্দনিক বোধের অবসান হতে দেয়নি। মদনতাঁতি যে শুধুমাত্র একজন দক্ষ কারিগর বা শিল্পী তাইই নয়, তার মধ্যে রয়েছে নান্দনিকবোধ এবং এই নান্দনিকবোধই মদন তাঁতিকে কখনও সংগ্রাম-বিমুখ হতে দেয়নি। সে যেকোনো মূল্যে তার নিজের প্রচেষ্টায়, নিজের পেশার মর্যাদা রক্ষা করতে সদা প্রস্তুত। এখান থেকেই আমরা এক জাত শিল্পীর সংগ্রামী চেতনাকে নিজের চোখেই দেখতে পাই।

প্রসঙ্গত তৎকালীন বাংলাদেশের বস্ত্রসংকটকে আরও সাবলীল ভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পটি সম্পর্কে জেনে নেওয়া ভীষণ আবশ্যক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পের মতোই এই গল্পেও আমরা ধনতন্ত্রের কদর্য রূপকে দেখতে পাই। দেখতে পাই অর্থাভাবে বিবস্ত্র নগ্ন ছায়ামূর্তিগুলোকে। এই 'দুঃশাসন' গল্পের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই একটি শ্মশানপুরি করা অর্থাৎ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ে শাঁ শাঁ করে শব্দ উঠেছে বন ঝাউগাছের সংঘর্ষে, সেখানে কোথাও কোনও মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। গল্পে আমরা প্রত্যক্ষ করি ধনতন্ত্রের নেশায় উন্মত্ত দেবীদাসকে। এই দেবীদাস একজন বড় ব্যবসায়ী তথা কাপড়ের আড়তদার; গৌরদাসের সঙ্গে মিশে এই দেবীদাসও অধিক অর্থের লোভে সমস্ত কাপড় মজুত করে রাখে। তৎকালীন দুর্দশাপ্লাবিত বাংলাদেশে দেবীদাস ভালোমতো জানে যে তার ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে সরকারি দরে কাপড় বিক্রি করতে গেলে পড়তা পোষাবে না। দরিদ্র মানুষরা দু'হাত জোড় করেও, কোনও বস্ত্র পায় না দেবীদাসের থেকে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পের মতোই চরম অরাজকতা সমগ্র জুড়ে লক্ষনীয়। তাই আমরা গল্পে পাই –

> "দু চোখে হঠাৎ আগুন জ্বলে গেল দেবীদাসের। কোন কারণ নেই– হঠাৎ দপ দপ করে উঠলো চোখের তারা দুটো। বাইরের জ্বলন্ত পৃথিবী থেকে খানিকটা জ্বালা কি প্রতিফলিত হয়ে পড়ল?"[১৫]

যখন সমগ্র বাংলাদেশে এত দারিদ্রতা বিরাজমান, তখন দারোগাবাবু শচীকান্তের নির্দেশে কনস্টেবল এল্. সি. কানাই দে দেবীদাসের কাছে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা নিতে আসে যাত্রাপালার জন্য। দেবীদাস একদমই মন থেকে টাকা দিতে না চাইলেও, সে জানে যে তার ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এটুকু খরচ করতেই হবে।

যেখানে সামান্য আলোর অভাবে সাপের দংশনে মানুষ মারা যায়, শেয়ালে ছোট্ট শিশুকে চুরি করে নিয়ে যায়; সেখানে দাঁড়িয়ে শচীকান্তের পেল্লায় বাড়িতে বৃহৎ বৃহৎ সমস্ত আলো জ্বলে উঠেছে বিনোদনের জন্য অর্থাৎ যাত্রাপালার জন্য। ধনতন্ত্র বাস্তবেই তার অরাজকতার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। যাত্রাপালায় পৌঁছে দেখা যায় শচীকান্তের গায়ে

দামী আদ্দির পাঞ্জাবী। ক্রমেই তার ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায় যাত্রাপালা, ক্রোধের আগুনে জ্বলন্ত ভীমের গদার আঘাতে দুঃশাসন মাটিতে আছড়ে পড়ে। তারপরেই আমরা দেখি দুঃশাসনের বুকে বিঁধে যায় ভীমের নখ, বুক থেকে রক্ত উথলে ওঠে। তারপর সেই রক্তরঞ্জিত হাতে পাণ্ডব ভীম দ্রৌপদীর চুলেরবেণী বেঁধে দিতে উদ্যত হয়ে বলে,

> "একটা প্রচন্ড অট্টহাসি করে ভীম বললে: এই রক্তাক্ত হাতে দ্রুপদ-নন্দিনীর বেণী বেঁধে দেব। প্রতিশোধ যজ্ঞের প্রথম আহুতি দেওয়া হল আজকে।"[১৬]

তারপর দশমিনিট ধরে টানা হাততালির শব্দে ভরে ওঠে শচীকান্তের বাড়ি।

যাত্রাপালা শেষে দেবীদাস ও গৌরদাস ফেরার পথে মুচিপাড়ার দিকে পা বাড়ায় লক্ষণমুচির থেকে দেবীদাসের দুজোড়া জুতো নিতে। এই মুচিপাড়াতেও করুণ দশা খুবই সুস্পষ্ট। সেখানে এখনও পুত্রহারা মা কেঁদে চলেছে কারণ তার সন্তানকে শেয়ালে চুরি করে খেয়ে নিয়েছে, এমনকি তার ঘরের পাশেই। এখানেও নগ্ন ছায়ামূর্তি গুলো ছুটে বেড়াচ্ছে। হতদরিদ্র মুচিদের ভাঙ্গা ঘর গুলো জীর্ণ ও ভঙ্গুর। হঠাৎ চমকে উঠে রক্ত ছলছল করে ওঠে দেবীদাস এবং গৌরদাসের। ঘাটের থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল কিন্তু হঠাৎ সে বিদ্যুৎগতিতে মিলিয়ে যায়, আসলে বস্ত্রাভাবে মেয়েটি যে সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনও এক ফালি কাপড়ও নেই তার শরীরে, অবশ্য কাপড় পাবার কোন উপায় টুকুও যে নেই। এই যুগের ধনতান্ত্রিক দুঃশাসন তার নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করে চলেছে তাদের। সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে এই লোলুপ পৃথিবীর সামন। গৌরদাসের মনে হতে থাকে –

> "যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?"[১৭]

লেখক বীরেন্দ্র দত্তের মতে –

> " 'দুঃশাসন' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে দুষ্ট, অত্যাচারিত, অবহেলিত সর্বহারাদের পক্ষে থেকে ভাবীকালের অগ্নিগর্ভ বিপ্লবী সত্তার প্রতিষ্ঠায় নির্দিষ্ট। কেন্দ্রে আছে রক্তাক্ত প্রতিবাদী স্বভাবের আদর্শশীলিত স্বপ্ন ও শপথদীপ্ত শক্তিমানতা।"[১৮]

বাস্তবেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত 'দুঃশাসন' গল্পে আমরা চরম সামাজিক অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট চিত্রটি দেখতে পাই। যেখানে ধনতন্ত্র নিজের শখ-আহ্লাদ পূরণে কার্যকর অথচ হতদরিদ্র মানুষদের জন্য বরাদ্দ শুধুমাত্র লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' এবং 'দুঃশাসনীয়' গল্পের সাথে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পটির কাহিনি ও প্রেক্ষাপটে মিল থাকলেও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আমরা লক্ষ্য করেছি একটি প্রতিরোধের ছাপ। সেখানে একটি প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর সদর্পে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে শ্রেণিশক্তি। ধনতন্ত্রের পাপাচারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চেয়েছে শ্রেণি শক্তির একত্র প্রচেষ্টা। ফ্রয়েডীয় চেতনার বাইরেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বারংবার আমরা প্রতিরোধ খুঁজে পেয়েছি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পে যখন যাত্রাপালায় দুঃশাসনকে ভীম তার পাপকর্মের জন্য শাস্তি দিচ্ছে, প্রকৃত অর্থে কি তৎকালীন বাংলায় কোনও ভীমকে আমরা পেয়েছিলাম যে এই ধনতন্ত্রের ধনতান্ত্রিক লোভীদের তাদের পাপের যোগ্য শাস্তি দেবে? বা আমরা আদৌ কি কোনও শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলাম যে তৎকালীন বাংলার শত দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণ থেকে রক্ষা করবে? তবে কি শ্রেণিশক্তি হেরে যাচ্ছে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছে? একদিকে শোষকশ্রেণির নির্দয় অত্যাচার বারংবার বাংলাকে কলুষিত করেছে, পাশাপাশি দরিদ্র মানুষদের ওপর অমানবিক শোষণ চালাচ্ছে। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আবারও বাঁচিয়ে তুলেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই মানুষের স্পর্ধাকে বহু গুণ বাড়িয়ে তোলে। আবার লেখক বীরেন্দ্র দত্তই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন –

> "সেই গল্পটির মন্বন্তর কলঙ্কিত বস্ত্রসংকটের পটভূমিতে বিষয় প্রসঙ্গে আছে রাতের গভীরে অন্ধকারে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নির্লজ্জ জীবনধারণের অসহায়তার কথা। কিন্তু সেখানে কোনো শপথ নেই, আছে খণ্ড খণ্ড চিত্রের নির্মমতার, রূঢ় বাস্তবতার রুক্ষ রূপ। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকদের এক অন্ধকার যাদের সামনে এনে দাঁড় করান। তার বীভৎসতা ও অসহায়তা, তার

> নির্লজ্জতা ও নীতিহীনতা, তার মূলের ক্রোধ ও অবক্ষয় গল্পের পরিবেশের রক্তচক্ষু আদ্যন্ত রক্তিম করে রাখে।"[১৯]

এই 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' আর পাঁচটা 'তন্ত্র' - এর মতো স্বার্থান্বেষী নয়। 'শিল্পী' গল্পে আমরা মদনতাঁতির স্পর্ধা দেখেছি, 'দুঃশাসনীয়' গল্পেও আমরা রাবেয়ার স্পর্ধাকে দেখেছি। তাদের সম্মানবোধই তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পে আমরা কোনও প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর খুঁজে পাই না। কে শাস্তি দেবে এই চোরাকারবারীদের? এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একত্র করেছেন শ্রেণিশক্তিকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার নগ্ন ছায়ামূর্তিদের কষ্টতে কাঁদেননি, বরং জনজাগরণ গড়ে তুলেছেন ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার লেখার মাধ্যমে। বৈপ্লবিক জনজাগরণ আমরা লক্ষ্য করি তার গল্পে, যেখানে মানুষ কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে শিখেছে, মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, প্রতিরোধে সামিল হয়েছে। মদনতাঁতির ও রাবেয়ার মত চরিত্রগুলোই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে রাবেয়ার আত্মহত্যা প্রসঙ্গে লেখক শীতল চৌধুরী বলেছেন–

> "খণ্ড-খণ্ড ঘটনা ও অনেক চরিত্র নির্ভরতায় একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্বযুদ্ধও মন্বন্তরজনিত বিভৎসতায় আক্রান্ত গ্রামবাংলার একটা সুস্পষ্ট ছবি 'দুঃশাসনীয়' গল্পে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আনোয়ারের স্ত্রী রাবেয়ার মৃত্যু এখানে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। লেখক আমাদের রাবেয়ার মৃত্যুকে সামনে এনে এই ইঙ্গিতই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন— গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে এমন আত্মহননের কাল যেন উপস্থিত। গল্পটির আসল ব্যঞ্জনা ও সার্থকতা এখানেই।"[২০]

তবে এই বিষয়টিও আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে 'শিল্পী' গল্পে মদনতাঁতি যদি সত্যি ভালো সুতো ন্যায্যমূল্য পেত, তবে কি সে বেনারসী শাড়ি বুনতো না? আচ্ছা সেই বেনারসী শাড়ি কেনার ক্ষমতা কখনোই কি দরিদ্র মানুষদের হতো? খেটেখাওয়া মানুষরা কি সেই দামী শাড়ি কিনতে সমর্থ হতেন? সেই দামী বেনারসী শাড়ি কেনার ক্ষমতা ঘুরেফিরে হতো সেই ধনতন্ত্রের নেশায় বুঁদ মানুষগুলোর স্ত্রীদের বা তাদের পরিবারের লোকেদেরই। মদনতাঁতির শিল্পীসত্তাই কি প্রধান হয়ে দাঁড়ায় না এই গল্পটিতে? মদনের চেতনায় তো মিশে আছে শিল্পীস্বাতন্ত্র্যই! সেটাই তো তাকে বারংবার গামছা বোনা থেকে বিরত রেখেছে। ভেবে দেখলে এই ধনতন্ত্রই কি খেটেখাওয়া শিল্পী মানুষদের উপার্জনের পথকে কিছুটা সাবলীল করে তোলে না? আমরা কি একদমই তা নাকচ করতে পারি? বাস্তবে একটু দামি বেনারসী শাড়ি কেনার ক্ষমতা তো সেই ধনী লোকেদেরই থাকবে। সেই দিক থেকে ভেবে দেখলে মদনতাঁতির মনে তার আত্মমর্যাদাই তার শিল্পীস্বাতন্ত্র্যর মূল কান্ডারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যেমন হাজারবার শোষকশ্রেণির, ধনতন্ত্রের ও বণিকতন্ত্রের ভুল দেখতে পাই, এর সাথে তো আমরা এটাও দেখতে পাই যে সমাজে সাম্যতা আনার জন্য সকল তন্ত্রেরই তুলনামূলক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আমাদের এটাও ভেবে দেখা উচিত যে বণিকতন্ত্রের এবং ধনতন্ত্রের মাধ্যমে শিল্পসত্তা ও শিল্পীসত্তারও বিকাশ ঘটেছে। মদনের শিল্পীস্বাতন্ত্র্য ছাপিয়ে গেছে মদনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে। এটাও বলা যেতে পারে যে মদনতাঁতি যতটা না সমাজতান্ত্রিক, তার চেয়েও অনেক বেশি একজন একনিষ্ঠ সক্রিয়কর্মী। ভেবে দেখলে এখানে কিন্তু বাস্তবেই আমরা শৈল্পিক চেতনা উন্মেষ দেখতে পাই। রাজনীতির মোড়ক থেকে বেরিয়ে আমাদের একবার হলেও বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। তবে গল্পে মদনতাঁতি সকলের পাশে ছিল এবং সেও এই শ্রেণিঅবরোধে নিজেকে শামিল রেখেছিল। আমরা গল্পটি জুড়ে একজন শিল্পীর তার শিল্পের প্রতি ভালবাসাকে খুঁজে পাই। একজন প্রকৃত শিল্পী আমৃত্যু পর্যন্ত শিল্পকে নিয়েই বাঁচার ক্ষমতা রাখে। মদনতাঁতি বাস্তবে প্রকৃষ্ট উদাহরণ একজন জাত শিল্পীর এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আমরা দেখেছি, ধনতান্ত্রিক দুঃশাসনেরা যখনই এই বাংলার মুখ থেকে নান্দনিকতাকে, বাঁচার অধিকারকে, স্বাধীনতাকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ছিনিয়ে নিচ্ছে; তখনই একত্র হয়েছে খেটেখাওয়া মানুষের দল। যুগে যুগে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এই শ্রেণিশোষকদের। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিস্পর্ধী লেখায় কখনোই তারা লুকোতে সমর্থ হয়নি। এটাই বাস্তব যে বাংলাদেশের তৎকালীন অবস্থাকে দেখেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম প্রতিরোধ করতে চেয়েছে, প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখার মাধ্যমে এক গণআন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্ররা নিজেরাই লড়াই করেছে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে, কারণ তাদের চেতনায় মিশে আছে প্রতিবাদের ভাষা। এটা খুবই সুস্পষ্ট ছিল যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে আমরা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট কারও ওপর শোষণ হতে দেখিনি, আমরা দেখেছি শিশুদের, আমরা দেখেছি নারীদের, আমরা দেখেছি মদনতাঁতির মতো চরিত্রদের; যাদের ওপর ক্রমাগত শোষণ চালিয়ে গেছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কিছু লোভী মানুষ। না! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই শেষ কথা নয়! তাঁর চেতনাই শেষ চেতনা নয়, বরং তাঁর চেতনা একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ যা ক্রমাগত মানুষকে ভাবায়। যা মানুষের চেতনায় স্পর্ধা সঞ্চার করে, মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

Reference :

১. যুগলবন্দী গল্পকার : তারাশঙ্কর মানিক, প্রজ্ঞাবিকাশ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৩৫৪
২. তদেব, পৃ. ৩৫৬
৩. তদেব,পৃ. ৩৫৭
৪. তদেব, পৃ. ৩৫৮
৫. তদেব, পৃ. ৩৬০
৬. তদেব, পৃ. ৩৬১
৭. তদেব, পৃ. ৩১৬
৮. তদেব, পৃ. ৩১৬
৯. তদেব, পৃ. ৩১৬, ৩১৭
১০. তদেব, পৃ. ৩১৯, ৩২০
১১. তদেব, পৃ. ৩১৮
১২. তদেব, পৃ. ৩২০
১৩. তদেব, পৃ. ৩২৩
১৪. তদেব, পৃ. ২৫৮, ২৫৯
১৫. দুঃশাসন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৫২, পৃ. ৩
১৬. তদেব, পৃ. ১২
১৭. তদেব, পৃ. ১৪
১৮. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪, পৃ. ৩১৬
১৯. তদেব, পৃ. ৩১৬
২০. চৌধুরী, শীতল, বাংলা ছোটগল্প: মননে-দর্পণে, প্রজ্ঞাবিকাশ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা-২০০৫, পৃ. ১৮৬

Bibliography :

আকর গ্রন্থ

যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক, প্রজ্ঞাবিকাশ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭

সহায়ক গ্রন্থ

যুগলবন্দী গল্পকার : তারাশঙ্কর মানিক, প্রজ্ঞাবিকাশ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭
দুঃশাসন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৫২
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, ছোটগল্পে ত্রয়ী : তারাশঙ্কর : মানিক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, নববর্ষ ১৪২১
বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪
শীতল চৌধুরী, বাংলা ছোটগল্প : মননে-দর্পণে, প্রজ্ঞাবিকাশ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা-২০০৫